ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ

অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ: বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৪

গবেষণা দল

অধ্যাপক সালাউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান, লোক প্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কো-অরডিনেটর

ড ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

উপদেষ্টা কমিটি

ড কামাল হোসেন, হেড অব চেম্বার এন্ড সিনিয়র পার্টনার, ড কামাল হোসেন এন্ড এসোসিয়েটস
সৈয়দ মঞ্জুর এলাহী, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
রোকেয়া আফজাল রহমান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট নারী উদ্যোক্তা
এ এস এম শাহজাহান, সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা
মাহফুজ আনাম, সম্পাদক ও প্রকাশক, দি ডেইলি স্টার
ড দিলারা চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী
ব্যারিস্টার মঞ্জুর হাসান, ও.বি.ই., উপদেষ্টা, আইজিএস, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি
ড সি আর আবরার, অধ্যাপক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমমনা কর্তৃক সমীক্ষা

অধ্যাপক নিজাম আহমেদ, লোক প্রশাসন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

লাইবেল চেক

ব্যারিস্টার সারা হোসেন, অনারারি নির্বাহী পরিচালক, ব্লাস্ট

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ২০১৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org
ফেসবুক: www.facebook.com/TIBangladesh

মুখবন্ধ

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এমন বাংলাদেশ দেখতে চায় যেখানে সরকার, রাজনীতি, ব্যবসা, নাগরিক সমাজ এবং জনগণের জীবন দুর্নীতির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে। সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে পরিবর্তনের দাবী উত্থাপন ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন আমাদের অন্যতম লক্ষ্য। আমাদের গবেষণা, প্রচার, ক্যাম্পেইন এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য দেশে দক্ষ, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক সুশাসন গড়ে তোলা ও দুর্নীতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, আইনী ও প্রায়োগিক সামর্থ্য বৃদ্ধিতে অবদান রাখা।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এবং সুশাসন ও জবাবদিহিতার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানসমূহ টিআইবি'র সার্বক্ষণিক গবেষণা কার্যক্রমের অন্যতম অধিক্ষেত্র। এই প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা সরকারি, বেসরকারি ও ব্যবসা খাতের সততা এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার কাঠামো ও অনুশীলনের সমন্বিত রূপ। ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানের উপর আমরা ধারাবাহিকভাবে গবেষণা, জরিপ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক ডায়াগনস্টিক স্টাডি পরিচালনা করে কেবলমাত্র সুশাসনের জন্য চাহিদা সৃষ্টি করেছি তাই নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ কিছু আইনী, প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত পরিবর্তনের অনুঘটকের ভূমিকা পালন করেছি।

এ প্রেক্ষিতে সার্বিকভাবে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার উপর পরিচালিত এই প্রথম গবেষণা শুদ্ধাচার ব্যবস্থার সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে অংশীজনদের জন্য তিন ধরনের বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

প্রথমত, এটি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনী; সম্পদ-গত ও সুশাসন বিষয়ক সামর্থ্য; ভূমিকা ও চর্চার গভীর এবং সার্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে একদিকে তাদের একটি তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেছে অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপূরক ও কৌশলগত নীতি সংস্কারের মাধ্যমে আরও বেশি কার্যকর হয় তার সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

দ্বিতীয়ত, এই একই গবেষণা দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের অনেক দেশে সমান্তরালভাবে পরিচালিত হওয়ায়, তা গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত দেশ সমূহের মধ্যে অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পারস্পরিক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করবে।

এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ প্রণয়নের প্রেক্ষিতে যেহেতু এই গবেষণাটি প্রণীত হয়েছে, আমরা আশা করি সরকারের উক্ত কৌশল বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এই গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখছি যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীজন হিসেবে টিআইবি সরকারের শুদ্ধাচার কৌশলের সবল ও দুর্বলতার ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পৃথক আরো একটি গবেষণা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

অধ্যাপক সালাহউদ্দিন এম আমিনুজ্জামান এবং অধ্যাপক সুমাইয়া খায়ের নিরলস প্রয়াস এবং আন্তরিকতার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন। টিআইবি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ। এই গবেষণার জন্য গঠিত উপদেষ্টা গ্রুপের সম্মানিত সদস্যদের অপরিসীম অবদানের কারণে গবেষণাটি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনার জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর মত ভাষা আমাদের নেই। একই সাথে গবেষণা প্রক্রিয়ায় মুখ্য তথ্যদাতাগণ এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞ যারা গবেষণাটির পর্যালোচনা ও লাইবেল চেকিংয়ের কাজ করেছেন তাদের কাছেও টিআইবি কৃতজ্ঞ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সচিবালয়ের সহকর্মীবৃন্দ, যারা নানাভাবে সহযোগিতা করে এই গবেষণাটি সম্ভব করেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে টিআইবি'তে আমার সহকর্মীদের নিরলস অবদানের জন্য তাদের প্রতিও ধন্যবাদ।

এই গবেষণার ব্যাপারে পাঠকের যেকোন মন্তব্য, সমালোচনা এবং পরামর্শ টিআইবি সাদরে গ্রহণ করবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সার সংক্ষেপ

এটি সর্বজন স্বীকৃত যে জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার আওতায় প্রতিষ্ঠান ও খাতসমূহ যদি সম্মিলিতভাবে এবং একযোগে কাজ করে তখন তা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রসারে এবং দুর্নীতিকে নিরুৎসাহিত করার মত পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট দেশে দুর্নীতি প্রতিরোধে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরতা ও সামর্থের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থা সার্বিকভাবে নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান সমুহের সমন্বয়ে গঠিত: সংসদ, নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পুলিশ (আইন প্রয়োগকারী সংস্থা), বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম এবং ব্যবসা খাত।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার এই প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে তার সক্ষমতা, সুশাসন এবং ভূমিকার আলোকে বক্ষ্যমান প্রতিবেদনে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সমীক্ষার সময়ে আইন ও অনুশীলনের মধ্যেকার দুরত্বকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আইন এবং প্রকৃত প্রাতিষ্ঠানিক চর্চাকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, এবং এটি প্রণয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করা হয়েছে, বিশেষ করে সংশ্লিষ্ট আইন ও গবেষণা পর্যালোচনা, গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রতিবেদন এবং মুখ্য তথ্যদাতার সাথে আলোচনা, সমমনা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক সমীক্ষা (Peer Review), মানহানির সম্ভাব্যতা যাচাই (Libel Check) এবং উপদেষ্টা কমিটি কর্তৃক যাচাইকরণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে বাংলাদেশের শুদ্ধাচার ব্যবস্থার আইনী কাঠামো খুব শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও সামগ্রিক চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দুর্বল বৈশিষ্টসম্পন্ন। তুলনামুলকভাবে মানসম্পন্ন আইনের অস্তিত্ব থাকলেও আইনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততা বা অনুপস্থিতি এবং বিরাজমান আইন না মানার সংস্কৃতি সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হয়। যদিও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব অব্যাহতভাবে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার পরেও অপরাপর পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার ওপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: দুর্বল তদারকি কার্যক্রম, সম্পদের অপ্রতুলতা, প্রণোদনার অভাব, সংশ্লিষ্টভাবে কারিগরী ও পেশাগত সক্ষমতার অভাব, রাজনীতিকরণ, স্বজন প্রীতি, দুর্নীতি এবং দুর্নীতির দায়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অনুপস্থিতিতে অস্বীকার/আইনের উর্ধ্বে থাকার সংস্কৃতি। বিষয়গুলো আরো প্রকট হয়েছে অধিকারের ব্যাপারে জনগণের মাঝে নিম্নমাত্রার সচেতনতা এবং তথ্যের অভিগম্যতার অপর্যাপ্ততার কারণে।

আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক এবং নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালিত হচ্ছে। এর পরেই অবস্থান করছে নির্বাহী বিভাগ এবং সুশীল সমাজ। উল্লেখ্য, প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই সক্ষমতা ও ভূমিকার তুলনায় সুশাসনের কার্যকরতা নিম্নপর্যায়ের পরিলক্ষিত হয়েছে। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং সততার নীতির সমন্বয়ে গঠিত সুশাসনের অভাবের ফলে প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যতা বজায়ের ঘাটতি থাকায় ক্ষমতার অপব্যবহারের এবং দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পায়।

অন্যদিকে সক্ষমতা এবং সুশাসনের তুলনামুলক ঘাটতির পরেও কিছু প্রতিষ্ঠান (যেমন: গণমাধ্যম ও সুশীল সমাজ) তাদের দুর্নীতিবিরোধী ভূমিকার জন্য যথেষ্ট শক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকে এটি সহজেই বোঝা যায় যে পরিবর্তনের পক্ষে শক্ত সদিচ্ছা থাকলেই কেবল পরিচালনাগত দুর্বলতা সত্ত্বেও পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর। বাংলাদেশের জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার প্রতিটি স্তম্ভের অবস্থান সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

একটি শক্তিশালী সংসদীয় রীতির সরকারের ব্যাপারে বাংলাদেশে সাংবিধানিক এবং আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে। তবে দ্বান্দ্বিক রাজনীতি, দুর্বল মানের সংসদীয় সংস্কৃতি, নির্বাহী বিভাগের বিস্তৃত নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতাসীন দলের আধিপত্য এবং বিরোধীদলের অব্যাহতভাবে সংসদ বর্জনের সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সংসদীয় ধাঁচে সরকার পরিচালনার স্পৃহা এবং পদ্ধতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ এবং এটি প্রমাণিত যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংসদে খুব কমই আলোচিত হয়ে থাকে।

জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার ক্ষেত্রে জনগণের জন্য তেমন কোন সুযোগ নেই। জনপ্রতিনিধিরা প্রায়শঃই দুর্নীতি এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পৃষ্ঠপোষকতায় নিবেদিত থাকার কারণে আইন প্রণয়নের দায়িত্বের ক্ষেত্রটি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সরকারের নির্বাহী বিভাগের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা করে থাকেন। সমালোচকরা এটিকে "প্রধানমন্ত্রীর একনায়কতন্ত্র" অভিধায় চিহ্নিত করেছেন। আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন পুরোপুরি অসমতল এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রাধান্যকৃত। রাষ্ট্রের বা সরকারের প্রধানের কিংবা মন্ত্রী পরিষদের সসদ্যদের সম্পদের বিবরণ প্রকাশের কোন আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই এবং শুধু তাই নয়, মন্ত্রী বা সংসদ সদস্যরা সরকারের সাথে ব্যবসার মাধ্যমে সম্পৃক্ত হতে পারবেন না তার কার্যকর নিয়ন্ত্রণেরও কোন ব্যবস্থা নেই।

রাজনৈতিক বক্তব্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি সামান্য স্বীকৃতিই পেয়েছে এবং নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে পৃথক হলেও নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক নিম্ন আদালত এখনও প্রভাবিত হওয়ায় সত্যিকারের স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার বিভাগের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে জন আকাংখা এখনো পূরণ হয়নি। সকল সরকারের সময়েই বিচার বিভাগ অব্যাহত হারে রাজনৈতিকভাবে দলীয়করণ হওয়ায় বিতর্কিত নিয়োগ, পদোন্নতি, চাকুরীচ্যুতি এবং বিচারকদের আচরণের মাধ্যমে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা সার্বিকভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। উচ্চ আদালতের বিচারকদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশের অনুপস্থিতি বিচার ব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

সেবা প্রদান, ব্যয়ের অগ্রাধিকার নির্ণয়/নির্ধারণ, সম্পদের বণ্টন, সেবা ও পণ্যের ক্রয় এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জনপ্রশাসন অধিকভাবে কেন্দ্রীভূত। জনপ্রশাসনের নানামুখী চ্যালেঞ্জের মধ্যে দুর্বল বেতন ব্যবস্থা, জবাবদিহিতা এবং দুর্নীতি অন্যতম। বিগত সময়গুলোতে জনপ্রশাসনের কর্মকর্তারা রাজনীতিকরণের শিকার হয়েছেন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনা থেকেই বিপুল সংখ্যক কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক ওএসডি করে রাখা হয়েছে। ওএসডিভুক্ত কর্মকর্তাদের সুনির্দিষ্ট কোন কাজের দায়িত্ব না থাকলেও জনগণের অর্থে তাদেরকে বেতন দেয়া হয়। সরকারী কর্মকর্তাদের সততা ও নিয়োগ প্রক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে। পদোন্নতির ব্যবস্থাও অস্বচ্ছ এবং সরকারি স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল।

তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদান এবং সুশাসনের বাহন হিসেবে স্থানীয় সরকারের ভূমিকা বাংলাদেশ সরকারের নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃত। বাস্তবে স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহ ধারাবাহিকভাবে অর্থ সংকটে ভুগছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সত্যিকারের বিকেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে 'নি-ঘণীভূতকরণে'র বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। বাজেট বরাদ্দ, প্রকল্প বাস্তবায়ন, আয়-ব্যয়ের হিসাব এবং উন্নয়নমূলক ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকাণ্ডের বাস্তবায়নে জনগণের সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় স্থানীয় সরকারের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব রয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে এবং দুর্নীতি, স্বচ্ছতার অভাব এবং দলীয়করণের কারণে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বের ভাবমূর্তির সংকট তৈরি হয়েছে।

নাগরিকদের পুরোপুরিভাবে নিরাপত্তা প্রদানে এবং গণতান্ত্রিক পুলিশি আচরণে ব্যর্থতার কারণে পুলিশ প্রশাসন সব সময়েই সমালোচনার শিকার হয়েছে। আইনের শাসন সমুন্নত রাখার পরিবর্তে সরকারসমূহ এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হিসেবে পুলিশ প্রশাসন নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর ফল হিসেবে পুলিশ তাদের কর্মতৎপরতায় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং বিচারের উর্দ্ধে থাকার সুযোগ ভোগ করায় বিচারহীনতার সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে পুলিশ বাহিনীর স্বাধীনতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, জবাবদিহিতা কাঠামো ভেঙে পড়েছে এবং জনস্বার্থে কাজ করার সদিচ্ছার ব্যাপারে জন আকাংখায় চিড় ধরেছে।

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এবং শক্তিশালী আইন কাঠামো থাকার পরেও রাজনৈতিকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে নির্বাচন কমিশন তার বিশ্বাসযোগ্যতা প্রতিষ্ঠায় সফল হয়নি। নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা নির্দলীয় হওয়ার কথা থাকলেও তাদের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ ছাড়াও ভোটার তালিকা প্রণয়ন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ, নির্বাচনকালে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণভাবে নির্বাচন পরিচালনায় সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকায় নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। স্থানীয়

প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করায় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনী বিধি লংঘনের ব্যাপারে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণে অধিকাংশ সময় ব্যর্থ হয়েছে।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় জনগণের অর্থের অদক্ষ এবং অপব্যবহার রোধে একটি বড় ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য বিশ্লেষণে সংস্থাটি তুলনামূলকভাবে সাফল্যের সাথে তার ভূমিকা পালন করে চলছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে, যদিও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ এই কার্যালয়ের প্রতিবেদনগুলো কার্যকরভাবে অনুসরণ করে না। সাংবিধানিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিকোন থেকে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় যে কোন ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব থেকে মুক্ত। এই কার্যালয়ের কর্মকাণ্ড পরিচালনায় ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা রয়েছে এবং সকল ধরণের অডিট প্রকাশ্যে করা হয় এবং সংসদে উপস্থাপনের পর তা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তবে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়সমূহ যেমনঃ স্বল্প জনবল এবং একটি সুসংহত অডিট আইনের অনুপস্থিতির কারণে এই কার্যালয়ের কর্মদক্ষতা প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের প্রতিবেদন চ্যালেঞ্জ করতে পারে।

“দন্তহীন বাঘ” হিসেবে অভিহিত দুর্নীতি দমন কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক কারণে জর্জরিত যা তার সার্বিক দক্ষতা ও কার্যকরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। দুদকের বিবিধ সমস্যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, ক্ষমতাসীন দলের দলীয় লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের ব্যাপারে কোন কার্যক্রম গ্রহণ না করা, স্বপ্রণোদিতভাবে তদন্তের উদ্যোগে অনীহা, দক্ষ আইনজীবির অনুপস্থিতি, গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণে সক্ষমতার ঘাটতি এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব। দুদকের নেতৃত্বের গুনগতমান এবং পেশাগত দক্ষতার মাত্রা, সততা এবং সংস্থার কর্মীদের বিশ্বাসযোগ্যতা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়া সত্ত্বেও জনবলের স্বল্পতা, অবকাঠামোগত সমস্যা এবং লজিস্টিক্যাল সুবিধার ঘাটতিতে ভুগছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কমিশনের স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা এবং সততা নিশ্চিতকরণে আইনী কাঠামো অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রায়োগিক ক্ষমতাহীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মূলত সুপারিশকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। সংস্থাটির তদন্ত খুব দুর্বল এবং ক্রমবর্ধমান অভিযোগের বৃদ্ধির বিপরীতে সংস্থাটি যথাযথভাবে সাড়া প্রদানে সক্ষম নয়। সরকারের কিছু নির্দিষ্ট সংস্থার কাছ থেকে কমিশন কোন রূপ সহযোগিতা পায়না। মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবর্তনের পক্ষে ওকালতির প্রয়াস সত্ত্বেও কমিশনের কাজের প্রভাব বাস্তবে তেমন দৃশ্যমান নয়।

তথ্য কমিশনের ব্যাপারে উচ্চ জন প্রত্যাশা সত্ত্বেও কমিশন সরকার ও অন্যান্য সংস্থা থেকে জাতীয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্ব-প্রণোদিতভাবে তথ্য চাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেনি। কমিশনের অপরাপর দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো হলো আপিল প্রক্রিয়া, তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সমন্বয় এবং তথ্য অধিকার আইনের বাস্তবায়ন চাহিদা ও যোগান পক্ষের বিরাজমান চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ। দুর্বল নেতৃত্ব, পেশাগত দক্ষতার অভাব এবং সরকারী সংস্থা সমূহের অসহযোগিতার কারণে কার্যকরভাবে তদারকির দায়িত্ব পালনে কমিশনকে সমঝোতা করতে হয়েছে।

কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া, দলের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর ব্যক্তিগতকরণ এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের অনুপস্থিতি হলো রাজনৈতিক দলগুলোর বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের সকল ক্ষমতাসীন দলই জনস্বার্থের নামে দলীয় স্বার্থের সম্প্রসারণে জনগণের সম্পদের উপর একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। রাজনৈতিক দলগুলো যেন গণতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হয় সে জন্য বিশদ আইনী কাঠামো থাকলেও আইন মান্য করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো খুবই দুর্বল। রাজনৈতিক ব্যবস্থা “দুবৃত্তায়ন” এবং বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়ার অংশ হয়ে গেছে। ভয়-ভীতি বা সুবিধা দেয়ার নামে রাজনৈতিক দলগুলো অস্বচ্ছভাবে দলীয় তহবিল সংগ্রহ করে থাকে।

একটি সুসংহত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জনদাবির সৃষ্টি এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধের চর্চা এবং সমান সুযোগের নীতি বজায় রাখতে সুশাসন এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের উপর চাপ সৃষ্টিতে সুশীল সমাজ তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। সুস্পষ্ট কৌশল এবং আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনে নির্দেশনার অভাবে সুশীল সমাজ আর্থিকভাবে টেকসই হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে

এবং টিকে থাকার ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিদেশী অনুদান নির্ভর হয়ে পড়েছে। সুশীল সমাজভুক্ত সংস্থাগুলোর গঠন ও রেজিস্ট্রেশনের আইনগত প্রক্রিয়ায় নমনীয়তা ও নিয়ন্ত্রণের মিশ্রণ ঘটায় তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে সরকারের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

ক্রমবর্ধমান বৈচিত্রময়তার কারণে বাংলাদেশের গণমাধ্যম অনেক উন্মুক্ত এবং অনেক স্বাধীন। দুর্বোধ্য এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আইনী কাঠামোর কারণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা, সরকারি গোপনীয়তা এবং আদালত অবমাননার অজুহাতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কার্যকরভাবে খর্ব করা হয়েছে। বড় বড় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজনীতিকরণ ঘটেছে এবং কর্পোরেট স্বার্থ এবং প্রতিযোগিতার মুখে পক্ষপাত দুষ্ট প্রতিবেদন এবং বিশ্লেষণ থেকে তা প্রমাণিত। কার্যকর স্বনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অভাবে গণমাধ্যমের জবাবদিহিতা ও সততা ক্ষয়িষ্ণুমান। বিশেষত: ব্যক্তিমালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলো সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি এবং সরকারের বিভিন্ন অনিয়ম ও অন্যান্য বিরোধপূর্ণ বিষয়ে উচ্চকিত হলেও সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যাঘাতের ভয়ে এক ধরনের আত্ম-সেন্সরশীপের অনুশীলন/চর্চা করে থাকে।

বাংলাদেশে ব্যবসা খাতের আইনী কাঠামো একইসাথে সহযোগিতামূলক এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিধির সংমিশ্রণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা এবং স্বাধীনতার ক্ষেত্রে মিশ্র অভিজ্ঞতার সূত্রপাত ঘটেছে। সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে অভিযোগ বা মামলা দায়ের অব্যাহতভাবে কঠিন হয়ে পড়েছে। কর্মীবল ও বিনিয়োগকারী সংক্রান্ত তথ্য এখানে সহজলভ্য নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং রাজনীতিবিদদের সাথে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশ্নবিদ্ধ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। সততামূলক উদ্যোগের ক্ষেত্রে এই খাতের আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা বিচ্ছিন্ন এবং অপর্যাপ্ত। সরকারি কাজ, পানি-গ্যাস, ফোন, বিদ্যুৎ সেবা এবং লাইসেন্সের ক্ষেত্রে দুর্নীতি একটি অতিসাধারণ ঘটনা।

সুপারিশমালা

সংসদ

- সংসদকে কার্যকর করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, বিশেষত জবাবদিহিমূলক শাসন ব্যবস্থার উপর সুস্থ বিতর্ক নিশ্চিত করতে হবে, সংসদ বর্জনের সংস্কৃতি আইন করে বন্ধ করতে হবে।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলোর সুপারিশ বাস্তবায়নে সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী কমিটিগুলো, বিশেষত সরকারি হিসাব সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের সদস্যকে নির্বাচিত করতে হবে। কমিটিগুলো গঠনের সময় সদস্যদের স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।
- সংসদ সচিবালয়ের পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।
- নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি বজায় রাখার স্বার্থে সংসদের স্পিকারকে সর্বদলীয় আলোচনা এবং ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত করতে হবে। বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করতে হবে। স্পিকার নিশ্চিত হবার পর দলীয় অবস্থান থেকে পদত্যাগ করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের খসড়া আচরণবিধি বিলকে আইনে রূপান্তর করতে হবে।
- সংসদ সদস্যদের আয়-ব্যয়, সম্পত্তি, ঋণ, আয়কর, মামলা এবং উন্নয়ন বাজেটের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য অবশ্যই প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিতভাবে সেই তথ্য হালনাগাদ করতে হবে।

নির্বাহী বিভাগ

- নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিতকল্পে কার্যবিধির (Rules of Business) সংস্কার করতে হবে।
- নির্বাহী বিভাগ এবং জনপ্রশাসনের উপর তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং শক্তিশালীকরণে কমিটি ব্যবস্থাকে ক্ষমতায়িত করাসহ সংশ্লিষ্ট আইন/বিধি সংস্কার অথবা প্রণয়ন করতে হবে।

বিচার ব্যবস্থা

- সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের অংশ হিসেবে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ আর্থিক এবং প্রশাসনিক স্বাধীনতা দিতে হবে।
- পদমর্যাদা, অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা এবং যোগ্যতার সাথে সঙ্গতি রেখে বেতন কাঠামো, সুবিধাদির বিষয়গুলোর পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সংস্থার (সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল বা বিচারকদের ফোরাম- (Judges Collegiums) মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ দিতে হবে।
- আয় ও সম্পদের বাধ্যতামূলক বার্ষিক প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণসহ সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদেরকে আচরণবিধি কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
- আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা দ্রুততার সাথে গ্রহণ করতে হবে এবং এ সংক্রান্ত সকল তথ্য জনগণকে জানাতে হবে।

জনপ্রশাসন

- ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার সমন্বয় ঘটিয়ে প্রশাসনের নিয়োগ, পদোন্নতি, পেশাগত উন্নয়ন, সততা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে স্বচ্ছতা এবং নিরপেক্ষতার বিধান রেখে সিভিল সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- জন প্রশাসনের সকল পর্যায়ের কর্মীদের জন্য দক্ষতা-ভিত্তিক পেশাগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।
- সরকারি কর্মকর্তাদেরকে সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ ও বাৎসরিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করতে হবে।
- সরকারি খাতের কর্মদক্ষতাকে প্রভাবিত করে এমন কাঠামোগত, ব্যবস্থাপনা এবং আচরণগত বিষয়গুলোর পরীক্ষা এবং সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে সরকার "সুশাসন পর্যালোচনা এবং সংস্কার কমিশন (Governance Review and Reform Commission)" গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

আইন-শৃংখলা বাহিনী (পুলিশ)

- পুলিশের পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, নিরপেক্ষতা, পেশাগত দক্ষতা, সততা এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় - এই জাতীয় ধারা সংযুক্ত করে পুলিশের জন্য সকল আইনী কাঠামোর সংস্কার করতে হবে।
- রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব থেকে পুলিশকে মুক্ত করতে হবে।
- পুলিশ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের মধ্যে কেউ দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং অন্যান্য অপরাধে অপরাধী প্রমাণিত হলে তাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।
- বেতনভাতা ও অন্যান্য সুবিধাদি, প্রশিক্ষণ, আধুনিক যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি সহায়তা, ফরেনসিক সুবিধার জন্য বাজেট বরাদ্দ বাড়িয়ে পুলিশের প্রণোদনা এবং সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

নির্বাচন কমিশন

- নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগে যোগ্যতার শর্তাবলী সম্বলিত আইন প্রণয়ন করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।

- নির্বাচনী আইন, বিধি এবং প্রবিধির প্রতিপালন পরিবীক্ষণ ও ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণের একটি কাঠামো গড়ে তুলতে হবে।
- সুষ্ঠুভাবে এবং দ্রুততার সাথে নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধ নিস্পত্তির বিধান প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে। নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে পর্যাপ্ত সংখ্যক উচ্চ আদালতের বেঞ্চ গঠন করতে হবে।
- নির্বাচনী আইন এবং নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নীতির সংস্কার কালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়

- অনতিবিলম্বে সকল সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে আলোচনা করে খসড়া অডিট আইনটি সংসদে পাশ করতে হবে।
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় যেন তার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হয় সে জন্য দক্ষ জনবল, আর্থিক বরাদ্দ এবং লজিষ্টিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে।
- অডিট পর্যবেক্ষণের বাস্তবায়ন নিশ্চিত কল্পে এবং ফলো-আপ করার জন্য এই কার্যালয়কে আইনী সুবিধা দিতে হবে।
- বিদ্যমান বিধির কঠোর প্রয়োগ এবং প্রয়োজনমত হালনাগাদ করতে হবে।

স্থানীয় সরকার

- স্থানীয় সরকারের কার্যকর ক্ষমতায়নে অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অপব্যবহার দূরীকরণে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন ধাপে সম্পদের বস্তুনিষ্ঠ বিতরণ ও বরাদ্দের জন্য সরকারকে অবশ্যই আন্তঃসরকার আর্থিক স্থানান্তর (Intergovernmental Fiscal Transfer) নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- জনগণের অর্থের বস্তুনিষ্ঠ বিতরণ এবং বরাদ্দ নিশ্চিতকল্পে এবং প্রস্তাবিত আন্তঃসরকার অর্থ স্থানান্তর নীতির পরিবীক্ষণে একটি স্থায়ী **স্থানীয় সরকার অর্থ কমিশন** গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ যেন তার সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় বিধি এবং প্রক্রিয়া প্রবর্তন করতে পারে।
- প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ সংগ্রহের জন্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা বাড়াতে হবে।
- সংসদ সদস্য কর্তৃক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের অপনিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধে আইনী সংস্কারসহ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

দুর্নীতি দমন কমিশন

- আইন অনুযায়ী কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কৌশলপত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- জনবলের সংখ্যাকে যৌক্তিক করার স্বার্থে দুদকের সাংগঠনিক কাঠামো পুনঃপরীক্ষা করতে হবে। দুদকের তদন্ত ও মামলা পরিচালনার সক্ষমতা বাড়াতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃতভাবে স্বাধীন এবং তার কার্যকরতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত কল্পে প্রয়োজনীয় ধারা অন্তর্ভুক্ত করে দুদক আইনের সংস্কার করতে হবে।
- দুদকের কাজে পরামর্শ প্রদান, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য খ্যাতিসম্পন্ন, সৎ, বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বিশেষজ্ঞ নাগরিকের সমন্বয়ে দুদক একটি 'নাগরিক পরামর্শক কমিটি' গঠনের বিষয়টি বিবেচনা করতে পারে।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

- রাজনৈতিক এবং অন্যান্য বিবেচনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কমিশনকে অবশ্যই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে স্বাধীন পর্যবেক্ষণ এবং সক্রিয় শক্তি হিসেবে কাজ করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- মানবাধিকারের সংজ্ঞা, কমিশনারদের যোগ্যতার মানদণ্ড, সুশৃঙ্খল বাহিনী কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার তদন্তে কমিশনারদের ক্ষমতা- এই বিষয়গুলো সংযুক্ত করে কমিশনের আইনের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে।
- প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার মাধ্যমে কার্যকর তদন্ত, প্রতিবেদন এবং কর্মের সাফল্যের জন্য কমিশনকে অবশ্যই তার সক্ষমতা বাড়াতে হবে।

তথ্য কমিশন

- তথ্য কমিশনের নেতৃত্বে গতিশীলতা আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং কার্যকর তদারকির ভূমিকা জোরদার করতে হবে।
- কমিশনার এবং কর্মীদের আয়, সম্পদ এবং দায় সংক্রান্ত তথ্যের বিস্তারিত বিবরণ জনগণের জন্য প্রকাশ ও নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করতে হবে।
- তথ্য কমিশনের দৃশ্যমানতা বৃদ্ধিতে এবং কর্মীদের ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে দক্ষতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- দেশে ও বিদেশে সংঘটিত বিভিন্ন পরিবর্তনের সাথে তাল মেলাতে তথ্য কমিশনকে তথ্য অধিকার আইন, প্রতিবন্ধকতা, উন্মুক্ততা, প্রযুক্তি, সামাজিক চাহিদা এবং জনগণের ধারণা – এই বিষয়গুলোর ওপর গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্রের চর্চা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- দলের নেতা থেকে সদস্য পর্যন্ত সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা, তথ্য প্রকাশ এবং জবাবদিহিতার ধারাগুলোকে দলীয় গঠনতন্ত্রে সংযুক্ত করতে হবে।
- দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে অপরাধমুক্ত রাখার স্বার্থে চিহ্নিত অপরাধী বা দণ্ডিত ব্যক্তিকে (সাজাভোগের পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত) রাজনৈতিক দলগুলো কোন সদস্যপদ প্রদান করবেনা- এরূপ চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোর আর্থিক বিবরণ ও অডিট রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনকে যথাযথভাবে দিতে হবে এবং আইন অনুযায়ী সময়মত প্রকাশ করতে হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলোকে তথ্য অধিকারের আওতায় আনতে হবে।

নাগরিক সমাজ

- বেসরকারি সংস্থা হিসেবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ সংস্থার গঠন, রেজিস্ট্রেশন এবং ব্যবস্থাপনার মান নির্ঝঞ্ঝাট ও সহজতর করা এবং অপ্রয়োজনীয় দ্বৈততা পরিহার সহায়ক আইনী কাঠামো পর্যালোচনা ও সংস্কার করতে হবে।

- নিজস্ব কর্মকাণ্ড এবং অর্থায়নের ব্যাপারে নাগরিক সমাজকে অধিকতর জবাবদিহিতা এবং স্বচ্ছতার চর্চা করতে হবে। দক্ষ পরিচালনা বোর্ড ও ব্যবস্থাপনা পরিষদ, কার্যকর তত্ত্বাবধান, পরিবীক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্ব-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে।
- কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং অর্থের ব্যবহারের ক্ষেত্রে নাগরিক সমাজকে স্ব- প্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করতে হবে। তদানুযায়ী, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং কার্যক্রমের প্রতিবেদন জনগণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

গণমাধ্যম

- গণমাধ্যমকে সরকার, দলীয় রাজনীতিক এবং অন্যান্য স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে। মুক্ত গণমাধ্যমের বিকাশের সুযোগ বৃদ্ধি এবং তা সংরক্ষণ করতে হবে।
- গণমাধ্যম খাতে গণতন্ত্রায়ন ও শৃংখলা প্রতিষ্ঠায় সহায়তার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট এবং সমন্বিত গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বান্ধব নীতি এবং আইনের প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে।
- গণমাধ্যমের লাইসেন্স প্রদানের পদ্ধতিকে স্বচ্ছ এবং যৌক্তিকভাবে সুসংহত করতে হবে।
- সুস্থ, সুষম এবং সঠিক সাংবাদিকতার স্বার্থে গণমাধ্যমকে অবশ্যই স্বতন্ত্র এবং স্বেচ্ছা ভিত্তিক আচরণ বিধির প্রবর্তন করতে হবে।
- সরকারি খাতের বেতার এবং টিভি'র পরিচালনায় দিক নির্দেশনা প্রদানের স্বার্থে আইনে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

ব্যবসা খাত

- ব্যবসা শুরুর প্রক্রিয়া সহজতর, কোম্পানীর কাঠামোতে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ, বৃহৎ অনানুষ্ঠানিক ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক খাতে স্থানান্তরের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা এবং যথাযথ প্রতিবেদন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে ১৯৯৪ সালের কোম্পানী আইনকে সংশোধন করতে হবে।
- আইন অনুযায়ী প্রতিবেদন দাখিল এবং প্রকাশ/তথ্য উন্মুক্ত করার বিধানকে প্রয়োগ করতে কার্যকর কৌশল অবলম্বন করতে হবে।
- বাধ্যতামূলকভাবে ব্যবসা সংক্রান্ত তথ্য স্বপ্রণোদিত প্রকাশের জন্য জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এ্যান্ড ফার্মসের রেজিস্ট্রার অফিসে কিংবা বিনিয়োগ বোর্ডে একটি জাতীয় ব্যবসা তথ্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- সরকারি/বেসরকারি খাতের বৃহৎ চুক্তি এবং সুনির্দিষ্ট পরিসীমা সম্পন্ন ব্যবসায়িক চুক্তি সংক্রান্ত তথ্যকে বাধ্যতামূলক প্রকাশ এবং পরিবীক্ষণের আওতায় আনতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও তাদের এসোসিয়েশনগুলোকে "যা ব্যয় করেছি তা প্রকাশ করব"-এই ধরনের স্বেচ্ছা চর্চার প্রচলন শুরু করতে হবে।
- রাজনীতি এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল পদে অধিষ্ঠ ব্যবসায়ীকে তার অবস্থানকে লাভজনকভাবে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে হবে।

জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থার কার্যকরতার জন্য এই ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত স্তম্ভসমূহের মধ্যে সুদৃঢ় সেতুবন্ধন ও মিথস্ক্রিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত সরকারি খাতের এক বা একাধিক স্তম্ভের কোন দুর্বলতা অপরাপর স্তম্ভকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। জাতীয় শুদ্ধাচার ব্যবস্থায় একদিকে অকার্যকর সংসদ ও সর্বময়-কর্তৃত্বসম্পন্ন নির্বাহী বিভাগ, এবং অন্যদিকে বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রমাগত দলীয়করণের ফলে সুশাসনের জন্য অপরিহার্য তদারকি ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বিভিন্ন কমিশনগুলোর (নির্বাচন কমিশন, দুদক, মানবাধিকার কমিশন ও তথ্য কমিশন) স্বাধীনতা এবং কার্যকরতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর জনগণের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়েছে। রাজনৈতিক দলসমূহ, নাগরিক সমাজ এবং গণমাধ্যমের ক্ষেত্রে সুদৃঢ় অভ্যন্তরীণ সুশাসনের অনুপস্থিতির কারণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে সার্বিকভাবে দেশের শুদ্ধাচার ব্যবস্থাকে হুমকীর সম্মুখীন করেছে।